যুগান্তর

তারিখ ······ 19 APR 2017
পৃষ্ঠা ···৩··· কলাম ···৬

শিক্ষক নিয়োগে রাজনৈতিক বিবেচনা ও দুর্নীতি বন্ধ হোক

দেশপ্রেমের চশমা

মুহাম্মদ ইয়াহ্ইয়া আখতার

শিক্ষা ক্ষেত্রে দুর্নীতি ও নৈরাজ্য আশংকাজনক পর্যায়ে পৌছেছে। সাম্প্রতিক সময়ে শিক্ষাঙ্গনের সর্বনিম্ন থেকে সর্বোচ্চ পর্যায় পর্যন্ত নৈরাজ্য ও দুর্নীতি ছড়িয়ে পড়েছে। এ নৈরাজ্য ছাত্রভর্তি, শিক্ষক নিয়োগ, প্রশাসনিক কার্যক্রম এবং দৈনন্দিন অফিস ব্যবস্থাপনাসহ সর্বক্ষেত্রে বিরাজমান। সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর প্রশাসনিক কার্যক্রম এবং দৈনন্দিন একাডেমিক পারফরম্যান্সে শৃঙ্খলার অভাব প্রকট হয়ে উঠেছে। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) সাম্প্রতিক এক গবেষণায় বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগে আর্থিক লেনদেনের ভয়াবহ তথ্য উপস্থাপন করেছে। ১৩টি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০০১ থেকে ২০১৬ সাল পর্যন্ত সময়ে প্রভাষক নিয়োগের তথ্য সংগ্রহ করে পরিচালিত গবেষণায় এসব বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রভাষক নিয়োগে ৩ থেকে ২০ লাখ টাকা আর্থিক লেনদেনের তথ্য উপস্থাপন করা হয়। টিআইবি প্রতিবেদনে আরও উল্লেখ করা হয়, সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রভাষক নিয়োগের অনিয়ম অনেক ক্ষেত্রে শুরু হয় সংশ্লিষ্ট প্রভাষকের ছাত্র থাকাকালীন। শিক্ষকদের কেউ কেউ বিশেষ পছন্দের শিক্ষার্থীকে টার্গেট করে তাকে বৈধ বা অনেক ক্ষেত্রে অবৈধভাবে আনুকূল্য দিয়ে ভালো ফল করিয়ে শিক্ষক হিসেবে বিভাগে যোগদানের চেষ্টা করান। আবার কমসংখ্যক শিক্ষক নিয়োগের জন্য বিজ্ঞাপন দিয়ে প্রায়ই অনেক বেশিসংখ্যক শিক্ষক নিয়োগ দেয়ার ঘটনা ঘটে। টিআইবি রিপোর্টে পাঁচটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৪টি বিভাগের জন্য প্রকাশিত ১৪টি বিজ্ঞপ্তিতে ৪৪ জন শিক্ষক নিয়োগের জন্য বিজ্ঞাপন দিয়ে ৯২ জন শিক্ষক নিয়োগ দেয়ার তথ্য উপস্থাপন করা হয়। উল্লেখ্য, এ রকম নিয়োগে অধিকাংশ ক্ষেত্রে যোগ্যতা ও মেধা প্রাধান্য পায় না। আবার মেধা থাকলেও টাকা না দেয়ায় অনেক ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরি হচ্ছে না। যুগান্তরের অনুসন্ধানী সাংবাদিকরা কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রভাষক পদে চারটি ফার্স্ট ক্লাস পাওয়া আবেদনকারীর কাছ থেকে প্রভাষক পদে চাকরি পাওয়ার জন্য ১২ লাখ এবং একই পদে তিনটি ফার্স্ট ক্লাস পাওয়া আবেদনকারীর কাছ থেকে ১৫ লাখ টাকা ঘুষ গ্রহণবিষয়ক কথোপকথনের চাঞ্চল্যকর তথ্য প্রকাশ করেছেন। এভাবে ঘুষ দিয়ে শিক্ষক হওয়ায় বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে অযোগ্য শিক্ষকের সংখ্যা বাড়ছে। আর এমন শিক্ষকরা একাডেমিক কাজের চেয়ে প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক কাজে বেশি সময় দিয়ে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে অধিকতর নৈরাজ্যময় করে তুলছেন।

বিশ্ববিদ্যালয়গুলো দেখভাল করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি) থাকলেও প্রতিষ্ঠানটি ঠুঁটো জগন্নাথে পরিণত হয়েছে। ব্যর্থ হয়েছে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায়। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে নিয়ম-শৃঙ্খলার মধ্যে আনতে মাঝে-মধ্যে উচ্চকণ্ঠ হলেও প্রতিষ্ঠানটি সে কাজে সফল হতে পারেনি। সরকার জানে, সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে সুশাসন ভেঙে পড়েছে। এজন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে একাডেমিক উন্নয়ন এবং প্রশাসনিক শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় সরকার অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল গঠনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এ লক্ষ্যে গত বছর ২৮ মার্চ মন্ত্রিসভার নিয়মিত বৈঠকে অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিলের খসড়া আইন অনুমোদিত হয়। প্রায় এক বছর পর এ বছর মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহে জাতীয় সংসদে অ্যাক্রেডিটেশন বিল পাস হয়। এখন সরকার এ কাউন্সিল গঠন করবে। একজন চেয়ারম্যান, চারজন পূর্ণকালীন এবং আটজন খণ্ডকালীন সদস্য নিয়ে এ কমিশন গঠিত হবে।

সরকার কখন কীভাবে কাদের দিয়ে এ কমিশন গঠন করে সে বিষয়টি দেখার জন্য অপেক্ষা করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিসি ও প্রোভিসি অথবা বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনে চেয়ারম্যান ও মেম্বার পদে যেভাবে সরকারদলীয় শিক্ষক বেছে বেছে নিয়োগ দেয়া হয়, সেই একই প্রক্রিয়ায় অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিলে যদি কেবল সরকার সমর্থক শিক্ষকদের নিয়োগ দেয়া হয়, তাহলে কাউন্সিল গঠনের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হবে। সেক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানটি একাডেমিক উন্নয়নের কেন্দ্র না হয়ে পরিণত হবে ভিন্নমতাবলম্বী শিক্ষকদের যাতনা ও হয়রানির কেন্দ্রে। তখন হয়তো কাউন্সিল সরকারি দল সমর্থক/মালিকানার বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে একভাবে এবং বিরোধী দল সমর্থক/মালিকানার বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে অন্যভাবে দেখভাল করবে।

সরকার কখন কীভাবে কাদের দিয়ে এ কমিশন গঠন করে সে বিষয়টি দেখার জন্য অপেক্ষা করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিসি ও প্রোভিসি অথবা বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনে চেয়ারম্যান ও মেম্বার পদে যেভাবে সরকারদলীয় শিক্ষক বেছে বেছে নিয়োগ দেয়া হয়, সেই একই প্রক্রিয়ায় অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিলে যদি কেবল সরকার সমর্থক শিক্ষকদের নিয়োগ দেয়া হয়, তাহলে কাউন্সিল গঠনের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হবে। সেক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানটি একাডেমিক উন্নয়নের কেন্দ্র না হয়ে পরিণত হবে ভিন্নমতাবলম্বী শিক্ষকদের যাতনা ও হয়রানির কেন্দ্রে।

সরকার যদি সত্যই অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিলকে উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় কার্যকর ভূমিকায় দেখতে চায়, তাহলে আমরা সরকারকে এ কাউন্সিলে নিয়োগদানের ক্ষেত্রে দলীয় পরিচয় আমল না নিয়ে দক্ষ, যোগ্য এবং নীতি-নৈতিকতার প্রশ্নে আপসহীন শিক্ষকদের নিয়োগ দিতে পরামর্শ দেব। এ রকম ব্যক্তিদের নিয়ে কাউন্সিল গঠন করে কাউন্সিলকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়ে সাহসিকতার সঙ্গে কাজ করার ব্যাপারে সহায়তা দিতে অনুরোধ করব। দলীয় স্বার্থের ঊর্ধ্বে উঠে সরকার যদি এভাবে অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল গঠন করতে পারে, তাহলে এ কাউন্সিলের পক্ষে উচ্চশিক্ষায় সুশাসন প্রতিষ্ঠায় অবদানমূলক ভূমিকা পালন করা সম্ভব হবে। অন্যথায় দলীয় লোকজন দিয়ে কাউন্সিল গঠন করা হলে তা আর পাঁচ-দশটি প্রতিষ্ঠানের মতোই প্রতিষ্ঠান হবে। সেক্ষেত্রে উচ্চশিক্ষার মানোন্নয়ন করা সম্ভব না হলেও এ প্রতিষ্ঠানে যারা নিয়োগ পাবেন, তারা চাইলে নিজেদের ভাগ্যোন্নয়ন করার সুযোগ পাবেন।

বর্তমানে বড় সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে স্বায়ত্তশাসনের নামে চলমান নৈরাজ্য নিয়ন্ত্রণে পরিবর্তন আনা জরুরি। সুশাসন ভেঙে পড়ায় এসব বিশ্ববিদ্যালয়ে ঠিকমতো ক্লাস হয় না। যথাসময়ে পরীক্ষা হয় না। অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ে একাডেমিক ক্যালেন্ডার অনুসরণ করা সম্ভব হয় না। সময়মতো পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয় না। ছাত্রভর্তি ও শিক্ষক কর্মচারী নিয়োগে নিয়ম-শৃঙ্খলা অনুসৃত হয় না। ফলে শিক্ষার্থীরা ক্লাস না করেও পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে পাস করে যেতে পারে। ছাত্র, শিক্ষক ও গ্রাজুয়েটদের মান ক্রমান্বয়ে নিচে নামছে। নবীন শিক্ষকদের অনেকে যথাযথভাবে দায়িত্ব পালন করেন না। একাডেমিক কাজের চেয়ে তাদের অনেকের প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক কাজে আগ্রহ বেশি। গবেষণায় নিয়োজিত হওয়ার পরিবর্তে অনেক নবীন শিক্ষকের সহকারী প্রক্টর বা আবাসিক হলের হাউস টিউটর হতে অথবা বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠদানে আগ্রহ বেশি। আবার কেউ কেউ সিনিয়র শিক্ষকদের সঙ্গে হেকেপ বা অন্য কোনো প্রজেক্টে যুক্ত হয়ে অর্থ নাড়াচাড়া এবং ভাউচার তৈরি করে স্বস্তিবোধ করেন। পদোন্নতির সময় এলে ইন্টারনেট থেকে অন্যের লেখা কপি করে প্রবন্ধ লিখে ও প্রকাশ করে পদোন্নতি নিতে চান অনেকে। আবার কেউ কেউ টাকা দিয়ে নিম্নমানের অনলাইন জার্নালে প্রবন্ধ ছেপে ওই প্রকাশনা দিয়ে পদোন্নতি পেতে চান। অন্যের গবেষণা নকল করে অনেকে ধরাও পড়েন। আবার কেউ কেউ কোনো অধ্যাপকের ছত্রছায়ায় তার সঙ্গে কাজ না করেও নিজেকে তার ক্লায়েন্ট বানিয়ে যৌথ প্রকাশনা করেন। অথবা কোনো সিনিয়র শিক্ষকের ঘনিষ্ঠ হয়ে তার লেখা প্রবন্ধে একক বা যৌথভাবে নিজের নাম যুক্ত করিয়ে নিজের লেখা বলে চালিয়ে দিয়ে পদোন্নতি নেন।

এক্ষেত্রে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক অধ্যাপকের গাফিলতি আছে। প্রভাষক নিয়োগের সময় রাজনৈতিক বা অন্য কারণে যোগ্যদের বাদ দিয়ে তারা অনেক সময় কম যোগ্যদের নিয়োগ দেন। এই নতুন নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষকদের যোগ্যতায় ঘাটতি থাকায় তারা অর্পিত একাডেমিক দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে পারেন না। আবার সিনিয়র শিক্ষকরা একবার অধ্যাপক হওয়ার পর অনেকে আর প্রকাশনা বা গবেষণা করতে চান না। নবীন সহকর্মীদের যেখানে তাদের গবেষণায় সহযোগিতা করার কথা, দিকনির্দেশনা দিয়ে তাদের ক্রমান্বয়ে লেখালেখিতে পারদর্শী করে গড়ে তোলার কথা, সেখানে অনেক অধ্যাপক জুনিয়রদের নতজানু ক্লায়েন্ট বানিয়ে রাখতে তাদের দিয়ে গবেষণা না করিয়ে নিজের লেখায় তাদের নাম যুক্ত করে পদোন্নতি পেতে সহায়তা করেন। আবার কেউ কেউ নিজ প্রবন্ধ নবীন সহকর্মীর নামে ছেপে তাকে দীর্ঘমেয়াদি ক্লায়েন্ট বানাতে চেষ্টা চালান। এভাবে সহায়তা করার নামে কোনো কোনো সিনিয়র অধ্যাপক অনেক নবীন শিক্ষককে একাডেমিকভাবে পঙ্গু বানিয়ে ফেলেন। উল্লেখ্য, এখন সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে তিন নম্বর গ্রেডের অধ্যাপকদের দুই নম্বর গ্রেডের অধ্যাপক হতে হলে তাদের কমপক্ষে দুটি প্রকাশনা করতে হয়। সে কারণে অনেক অধ্যাপক ইচ্ছা না থাকলেও গবেষণায় যুক্ত থাকছেন; কিন্তু একবার দুই নম্বর গ্রেডের অধ্যাপক হলে তাদের অনেককেই আর প্রকাশনার ব্যাপারে মনোযোগী দেখা যায় না। কারণ, দুই নম্বর গ্রেডের অধ্যাপক থেকে এক নম্বর গ্রেডের অধ্যাপক হতে হলে তাকে কোনো প্রকাশনা দেখাতে হয় না। এর ফলে দুই নম্বর গ্রেডের অধ্যাপকদের অনেকেই আর গবেষণায় যুক্ত থাকেন না।

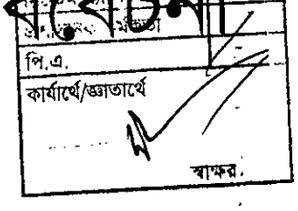

প্রকাশনার পাশাপাশি উচ্চতর ডিগ্রি প্রদানের ক্ষেত্রেও সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে অনিয়ম ও নৈরাজ্য বিরাজ করছে। এমফিল ও পিএইচডি ডিগ্রি প্রদানের ক্ষেত্রে সুশাসনের চর্চা দেখা যায় না। যেসব গবেষক এ রকম উচ্চতর ডিগ্রি নেয়ার জন্য গবেষণা করেন, তাদের মধ্যেও সুশাসনের চর্চা অনুপস্থিত। নকল করে থিসিস লিখে ধরা পড়ার অনেক নজির সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে রয়েছে। অনেক শিক্ষক এত বেশি গবেষণা ছাত্র নেন যে, তাদের সময় দিতে পারেন না। এর ফলে থিসিসের মান উন্নত হয় না। এসব থিসিস পার করাতে সুপারভাইজাররা অনেক সময় তাদের পরিচিত অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের পরীক্ষক কমিটিতে রাখেন। সব মিলিয়ে বলা যায়, দেশে উচ্চতর ডিগ্রিধারীর সংখ্যা বাড়লেও তাদের মান বাড়ছে না।

সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর একাডেমিক কার্যক্রমে শৃঙ্খলা ভেঙে পড়ায় বিশ্ববিদ্যালয়গুলো বিভিন্ন কার্যক্রম হাতে নিচ্ছে। এ লক্ষ্যে সম্প্রতি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রোভিসিকে প্রধান করে একটি ভিজিলেন্স টিম গঠন করা হয়েছে। এ টিম কোনো ঘোষণা না দিয়ে যে কোনো বিভাগ পরিদর্শনে যাবেন এবং ওই বিভাগের একাডেমিক কার্যক্রমের খোঁজখবর নেবেন। প্রতিটি বিভাগে চিঠি দিয়ে বিভাগীয় একাডেমিক কমিটি কর্তৃক একজন কাউন্সিলর নিয়োগ করতে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। ওই কাউন্সিলর শিক্ষক বিভাগীয় একাডেমিক কার্যক্রমের দেখভাল করবেন এবং কেন্দ্রীয় ভিজিলেন্স টিমের সঙ্গে লিয়াজোঁ রাখবেন। এটি একটি প্রশংসনীয় উদ্যোগ। তবে এখনই প্রশংসা না করে সংশ্লিষ্টরা নিরপেক্ষভাবে পেশাদারিত্বের সঙ্গে এ কাজ করে একাডেমিক উন্নয়ন ঘটাতে অবদান রাখতে পারলেই এ উদ্যোগকে সাধুবাদ জানানো সমীচীন হবে।

উচ্চশিক্ষাঙ্গনে বিদ্যমান নৈরাজ্যকর অবস্থায় বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শৃংখলা ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সরকারের অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল গঠনের সিদ্ধান্তটি সাধুবাদ পেতে পারে। তবে দেখার বিষয়, এ প্রতিষ্ঠানটিকে দলীয় প্রভাব এড়িয়ে পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করে যোগ্য, দক্ষ লোক দিয়ে গড়ে তোলা হয় কিনা। প্রতিষ্ঠানটি স্বাধীনভাবে কাজ করে দেশের উচ্চশিক্ষা মানসম্পন্ন করতে ভূমিকা রাখতে পারে কিনা। আশা করব সরকার রাজনৈতিক বিবেচনায় প্রভাবিত হয়ে অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল গঠন করে একে একটি অর্থহীন ঠুঁটো জগন্নাথ প্রতিষ্ঠানে পরিণত করবে না।

ড. মুহাম্মদ ইয়াহ্ইয়া আখতার : *অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান, রাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়*
akhtermy@gmail.com

ম্যানেজিং
পিআর এন্ড পাবলিকেশন্স বিভাগ
পি.এ.
কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে
স্বাক্ষর.